উয়ারী-বটেশ্বর : এমুলেট, গড়ুর, ঘোড়া ও অন্যান্যের সন্ধানে

শাশ্বতী মজুমদার
(সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)

বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে উয়ারী-বটেশ্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে প্রাচীন যে কয়টি সভ্যতা পাওয়া যায়, ইতিমধ্যেই উয়ারী-বটেশ্বর তার মধ্যে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। দ্বিতীয় নগরায়নের পরে গড়ে ওঠা এ জনবসতির সময়কালের ধারাবাহিকতা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এ বিষয়ে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক যুক্তিতর্ক রয়েছে ও গবেষনা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলো নিয়ে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনেক গবেষণা করেছেন যা বিভিন্ন সময়ে জার্নাল এবং বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বেশ কিছু গবেষণা হলেও এখানে প্রাপ্ত শিল্পদ্রব্য নিয়ে শিল্পতাত্ত্বিক কোন গবেষণা হয়নি বললেই চলে। আমার বর্তমান এই লেখার উদেশ্য প্রধানত এখানে প্রাপ্ত শিল্পদ্রব্যগুলোর হদিস নেয়া, তার স্থান কাল সম্পর্কে ধারনা দেওয়া এবং তার শৈল্পিক গুনাগুন বিচার করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বেশির ভাগ শিল্পদ্রব্যগুলোরই কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে কোন সময় কাল এখনো পর্যন্ত নির্ধারন করা হয়নি। একারনে এই গবেষণায় প্রাপ্ত শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের আলোচনা, উপাদান, বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্রাপ্ত শিল্পকলার সাথে তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে তার শিল্পগুনাগুন বিচারের চেষ্টা করা হবে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানব বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। এরমধ্যে উল্লেখ্য চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, ফেনীর ছাগলনাইয়া, কুমিল্লার লালমাই, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর। এসকল জায়গায় পুরোপলীয় ও নবপলীয় যুগের বিভিন্ন হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। উয়ারী-বটেশ্বরে তাম্রপ্রস্তর যুগের কৃষ্ণ ও রক্তিম মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে (রহমান এবং পাঠান ২০১২:১৭)। উপমহাদেশে সবচেয়ে প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল ২৭০০ থেকে ১৭০০ খৃস্টপূর্বাব্দ। এরপর দীর্ঘদিন, প্রায় ৭০০ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এ উপমহাদেশের কোথাও আর গুরুত্বপূর্ণ নগর সভ্যতার হদিস পাওয়া যায়নি। পরবর্তিতে আনুমানিক খৃস্টপূর্ব সাত-ছয় শতকে এ অঞ্চলের গঙ্গা উপত্যকায় আরেকটি নগর সভ্যতার বিকাশ হয়, যাকে দ্বিতীয় নগর সভ্যতা বলা হয়। বাংলাদেশের মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর এই দ্বিতীয় নগর সভ্যতার অন্তর্গত (রহমান ২০০৭:ii)। নরসিংদী জেলার অন্তর্গত বেলাব থানা থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দক্ষিন-পশ্চিমে উয়ারী (২৪ ডিগ্রি ০৫’ ৪৬”উত্তর অক্ষাংশ, ৯০ ডিগ্রি ৪৯’ ৪২” পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) ও বটেশ্বর (২৪ ডিগ্রি ০৫’ ৩৪” উত্তর অক্ষাংশ, ৯০ ডিগ্রি ৪৯’ ৪০” পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) দুটি পাশাপাশি গ্রাম অবস্থিত। প্রত্নবস্তুগুলো প্রধানত উয়ারী-বটেশ্বর এবং এর সংলগ্ন রাইঙ্গারটেক, আলগারটেক, পুবেরটেক, সোনারুতলা, হানিয়াবাইদ, আমলাব, ইছারটেক,কান্দুয়া এবং এর পার্শ্ববর্তী গ্রাম মরজাল, চন্ডিপাড়া, পাটুলী, জয়মঙ্গল, যোশর, কুমারটেক, চুলা, গেসাতিয়া, মন্দিরভিটা, জানখারটেক, পলাশ প্রভৃতি গ্রাম থেকে পাওয়া যায়।
উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব প্রথম জনসমুখে আনেন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক হানীফ পাঠান ও তার ছেলে মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান। তারা এ অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব বুঝতে পেরে সংগ্রহ করতেন ও গবেষনা শুরু করেন। এবিষয়ে বেশ কিছু প্রতিবেদন তারা পত্রিকায় দিলে পরে অন্যান্য গবেষকগন উৎসাহী হয়ে এই জায়গার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু নিয়ে গবেষনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯-১৯৯২ সালে অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কাজ পরিচালনা করেন এবং তার Ancient Bangladesh: A Study of the Archaeological Sources বইতে উয়ারী-বটেশ্বরের সম্ভাব্য সময়কাল ও এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। ২০০০ সালে এখানে বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের তত্ত্বাবধানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু হয় যা এখনো চলছে। এখন পর্যন্ত ৫০টি প্রত্নস্থান আবিস্কৃত হয়েছে। বেশির ভাগ জায়গায় প্রাচীন বসতির উপর আধুনিক বসতি গড়ে উঠেছে। এসব জায়গা থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতিয়ার, প্রচুর পরিমানে স্বল্প মূল্যবান পাথর, কাঁচ ও মাটির পুঁতি, ছাপাঙ্কিত রুপার মুদ্রা, লোহার তৈরি বিভিন্ন প্রত্নবস্তু, মাটির পাত্র, পোড়ামাটি, ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরি বিভিন্ন শিল্পকর্ম এবং প্রত্নবস্তু, পাথরের শিলনোড়া, বাটখাড়া প্রভৃতি প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। প্রাচীন স্থাপনার নিদর্শন পাওয়া যায় এখানে আবিস্কৃত দূর্গনগর থেকে। স্থানীয়ভাবে এ জায়গাটিকে অসম রাজার গড় বলা হয়। এখানের মন্দিরভিটা গ্রামে বৌদ্ধ পদ্মমন্দির এবং জানখারটেক গ্রামে বৌদ্ধ বিহারিকা নামে দুটি স্থাপত্য সম্প্রতি আবিস্কৃত হয়েছে।

কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে উয়ারী-বটেশ্বরের সময়কাল নিরুপনের জন্য এর দূর্গনগর থেকে প্রাপ্ত কাঠকয়লার নমুনা নেদারল্যান্ডের‘ঈবহঃৎঁস Voor Isotopen Onderzoek’ Mবেষণাগারে পাঠানো হয়। নমুনা সংগৃহীত স্তরটির সময় খৃস্টপূর্বাব্দ ৫৩৫ থেকে খৃস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের মধ্যে নির্ধারন হয় (রহমান এবং পাঠান২০১২:৯৬)। এ থেকে বোঝা যায় উয়ারী-বটেশ্বরের দুর্গ নগরে আদি প্রাগৈতিহাসিক কালপর্বেই মানব সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। পৃথিবীর যে কোন প্রাচীন সভ্যতার মত এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদীর পাড়ে। পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদের শাখা কয়রা, গঙ্গাজলি, পাহাড়িয়া, আড়িয়াল খা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে মানব বসতি গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের এই অঞ্চল

বন্যা উপদ্রুত এলাকা। সাধারনত বন্যার সময় এই অঞ্চলের কিছু অংশ ডুবে যায় আর উঁচু অংশগুলো জেগে থাকে। এখানকার ভূমিরূপের একক লক্ষ্য করলে দেখা যায় চার ধরনের, যথাঃ (ক) পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র প্লাবন সমভূমি, (খ)নতুন ব্রক্ষ্মপুত্র ও যমুনা প্লাবন সমভূমি, (গ)

মধ্য মেঘনা প্লাবন সমভূমি ও (ঘ) মধুপুর গড় বা মধুপুর কর্দম। মধুপুর গড় সবচেয়ে প্রাচীন, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্লাইস্টোসিন সময়ে গড়ে উঠেছে। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি ইত্যাদি স্থানে যেসব প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, সেগুলো সবই মধুপুর কর্দম স্তরসমষ্টি বেষ্টিত অঞ্চলের অন্তর্গত। মধুপুর গড় ব্যাপকভাবে উঁচু ও নিচু ভুমি দ্বারা গঠীত। উঁচু ভূমিকে চালা আর নীচু ভূমিকে বলা হয় বাইদ (রহমান২০১২:৩৪)। অধ্যাপক সূফী মোস্তাফিজুর রহমান এবং অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তীর (চক্রবর্তী ১৯৯২:৫৭) মতে উয়ারী-বটেশ্বর বন্যামুক্ত এলাকায় গড়ে উঠেছিল । সেক্ষেত্রে উয়ারী-বটেশ্বরে আদি ঐতিহাসিক যুগ থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় নগরায়নের মানব বসতি বিকশিত হয়েছিল তা আদি মধ্যযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বজায় আছে বিবেচনা করা যায়। ২০১৫ সালে মুহাম্মদ কামাল হোসেন আকন্দ (গঁযধসসধফ কধসধষ ঐড়ংংবহ অশধহফধ), পারলুইগি রোজিনা (চবৎষঁরমর জড়ংরহধ), পেদ্রো পি. চুনহা (চবফৎড় চ. ঈঁহযধ), স্বাধীন সেন (Swadhin Sen) এবং এস. এম. কে. আহসান (ঝ. গ. ক. অযংধহ) একসাথে ‘Alteration of the Alluvial Deposits of Wari-Bateshwar : Geoarchaeological Relevance of the Characterization of Grain Size and Clay Mineralogy’ নামে একটি গবেষনা প্রবন্ধ Journal of the Dept. Of Archaeology (Pratnatatta, Vol.21, June2015:15-39) এ প্রকাশ করেন। এই গবেষনায় তারা উয়ারী- বটেশ্বরের দূর্গ নগরীর এবং আশে পাশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাটি এবং অন্যান্য উপাদানের দানার আকারগত বিশ্লষণ, কাদার খনিজ বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারেন দূর্গ নগরী ও তার সংলগ্ন আদি ঐতিহাসিক সময়ের বসতিগুলো একটা সময় পরিত্যক্ত হয়েছিল। পরিত্যক্ত হবার কারন হিসেবে এখানকার নদী ব্যবস্থার পরিবর্তন, সমুদ্র তটরেখার স্থানিক বদল ও বন্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। উয়ারী- বটেশ্বরের দূর্গনগরি থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে গড়ে ওঠা আদি মধ্যযুগীয় মানব বসতিগুলো বন্যা পরবর্তি পলল সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বলে সনাক্ত করা হয়। এই আদি ঐতিহাসিক সময়ে গড়ে ওঠা দুর্গনগরি ও তার আসে পাশের মানব বসতি বন্যা অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিত্যক্ত হবার পর আদি মধ্যযুগীয় বসতি গড়ে ওঠার সময় কালের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। ধারনা করা হয় তা ৪০০-৭০০ বছর। অর্থাৎ দুর্গনগরি পরিত্যক্ত হবার ৪০০-৭০০ বছর পরে আবার উয়ারী বটেশ্বরের অন্যান্য অঞ্চলে মানব বসতির পত্তন হয়।

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর পরীক্ষা ও গবেষনার মাধ্যমে তাদের সময় কাল অনুমান করা যায়। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষভাগ থেকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস তেমন জানা যায় না। এ অঞ্চলে গুপ্ত শাসনামলের কোন নিদর্শন এখনো পাওয়া যায়নি। খ্রিস্টীয় ৭ম-৮ম শতকে এ অঞ্চল খক্ষ বংশের শাসনাধীন ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার আশ্রাফপুর থেকে পাওয়া খড়গ বংশীয় শাসক দেবখক্ষের একটি তাম্রশাসন ও একটি ব্রোঞ্জের চৈত্য থেকে (রহমান এবং পাঠান ২০১২:৯২)। প্রাপ্ত বস্তুর সময়কাল অনুমানে খৃষ্টীয় ২য় শতকের শেষ ভাগ থেকে উয়ারী-বটেশ্বরে দীর্ঘসময় মানব সভ্যতার তেমন নিদর্শন পাওয়া যায়না। পূর্বে গবেষকগন উয়ারী-বটেশ্বরে মানব বসতি গড়ে ওঠায় আদি ঐতিহাসিক যুগের সাথে আদি মধ্যযুগের যে সময়ের পার্থক্য আছে বলেছেন তা এ সময়ে হতে পারে। প্রাপ্ত শিল্পকলা উয়ারী-বটেশ্বরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আদি প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারের পাশাপাশি আদি ঐতিহাসিক ও আদি মধ্যযুগীয় অনেকশিল্পদ্রব্য পাওয়া গেছে। ধারনা করা হয় প্রধানত ধর্মীয় ও দৈনন্দিন কাজে এগুলো ব্যবহৃত হত। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাথরের তৈরি এমুলেট বা রক্ষাকবচ, গড়ুর মূর্তি, ব্রোঞ্জের ঘোড়া, মাটির পাত্র, পোড়ামাটীর পুতুল, পোড়ামাটির যক্ষমূর্তি, শিবনৈবদ্য পাত্র, কাঁচ ও পাথরের নকশা করা পুঁতি ,মাটির নেত্রদেবী, চৈত্য / স্তুপা ইত্যাদি।

মাটির পাত্র

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এর বিভিন্ন জায়গায় মাটির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অনেক প্রকার মাটির পাত্র বা তার অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আছে কৃষ্ণ এবং রক্তিম মৃৎপাত্র (Black and Red Ware), উত্তরাঞ্চলীয় কালো মসৃন মৃৎপাত্র (Northern Black Polished Ware), কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র (Black Slipped Ware), রোলেটেড মৃৎপাত্র (Rouletted Ware), গ্লেজড পাত্র (Glazed Ware), নবযুক্ত পাত্র (Knobbed Ware), স্টাম্পড মৃৎপাত্র (Stamped Ware), লাল প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্র (Red Slipped Ware), চিত্রিত মৃৎপাত্র (Painted Ware) প্রভৃতি।

চিত্রিত মাটির পাত্র, উয়ারী বটেশ্বর

প্রাচীন সব সভ্যতাতেই মৃৎপাত্রের উপস্থিতি পাওয়া যায়, দৈনন্দিন এবং ধর্মীয় প্রয়োজনে তারা মৃৎপাত্র ব্যবহার করত। শুধু প্রয়োজনের তাগিদে মৃৎপাত্র তৈরি হলেও তারা এতে বিভিন্ন নকশা করত বা ছবি আঁকত তাদের নান্দনিক ও ধর্মীয় আচার পালনের উদ্দেশ্যে। উয়ারী-বটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত মাটির পাত্রগুলোতেও এমন নকশা ও ছবির নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলো প্রধানত রেখাপ্রধান, জ্যামিতিক কিছু নকশা করা যা মাটির পাত্রের উপর শক্ত কোন সুচালো বস্তু দ্বারা খুদে তৈরি করা হয়। এ ধরনের নকশা পশ্চিমবঙ্গের পান্ডু রাজার ডিবিতে পাওয়া কিছু মৃৎপাত্রে দেখা যায়। এছাড়া মাটির পাত্রের উপর রং করা চিত্রিত পাত্র পাওয়া গেছে। এখানে পাওয়া গোলাকার একটি মৃৎপাত্রে ধূসর পৃষ্ঠদেশে লাল রঙয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। সম্ভবত শুধু হাতের আংগুলের মাধ্যমে উপরে অর্ধাবৃত্তাকার অনেকগুলি বিন্দু দিয়ে নীচে আবার আঙ্গুলে রং নিয়ে অনেকগুলো সরলরেখা টানা হয়েছে ডিম্বাকারে।এই অঞ্চলে প্রধানত সনাতন ধর্মালম্বি নারীরা হাতের আংগুল দিয়ে লক্ষীর ঘটে তেল সিঁদুর দিয়ে এই ভাবে বিভিন্ন ধর্মিয় প্রতীক আকেন। বিভিন্ন আদিবাসী ও জাতীগোষ্ঠির মধ্যে ধর্মীয় প্রথা পালনের জন্য মাটির ঘট, কলস ইত্যাদিতে হাতের আঙ্গুল দিয়ে চালের গুড়া অথবা বিভিন্ন রঙয়ের ব্যাবহার করে অনেক ধর্মিয় প্রতিক অথবা নকশা আঁকার প্রচলন আছে।

পাথরের এমুলেট বা রক্ষাকবচ

এই অঞ্চলে পাওয়া শিল্পদ্রব্য গুলোর মধ্যে এই পাথরের এমুলেট বা রক্ষাকবচটি নিয়ে গবেষকগন সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন। উয়ারী গ্রামের পশ্চিম দিকের সোনারুতলা গ্রামে এই এমুলেট পাওয়া যায় (রহমান এবং পাঠান ২০১২:১৩৯)।

পাথরের এমুলেট, উয়ারী-বটেশ্বর

লালচে ধূসর রঙের মসৃন আয়তকার এমুলেটের মাপ খুবই ছোট (৫২ মি. মি. / ২২মি. মি.)।এর উপরের দিকে দৈর্ঘ্য বরাবর দুটি ছোট ছিদ্র আছে। সম্ভবত ভিতরে সুতার মাধ্যমে গলায় ঝুলানোর জন্য। আয়তাকার পাথরের মাঝখানে উপবৃত্তাকার অংশে একটি খোদাই কাজ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় অংশে একটি দেব/দেবী মূর্তি, তার দু পাশে দুজন উপাসনারত প্রতিকৃতি, বাম পাশের পূজারীর পাশে একটি গাছ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিকৃতির উপরে দুপাশে কিছু ফুল ও জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। কেন্দ্রীয় মূর্তির এক হাতে লম্বাকার একটি বস্তু অন্য হাতে গোলাকৃতির আরেকটি বস্তু ধরে আছেন। তার চ্যাপ্টা নাক ও বড় চোখ মাথায় ত্রিকোনাকার চুলের খোপা বা শিরস্ত্রান রয়েছে। দুপাশের উপাসকদ্বয় করজোরে বসে আছেন, তাদের পরনে ধুতির মত পোষাক। এই খোদিত শিল্পকর্মটি নিয়ে একেক প্রত্নতাত্ত্বিক একেক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তবে কোন সিদ্ধান্তই এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়নি।

দীলিপ কুমার চক্রবর্তীর ১৯৯৬ সাল্ছেঞড়ি বীধসঢ়ষবং ড়ভ গধহুঁধহ অৎঃ ভৎড়স ইবহমধষ্ব শিরোনামে একটি প্রবন্ধ Journal of Bengal Art(Vol.1,1996) এ প্রকাশিত হয়। এতে উয়ারী-বটেশ্বর থেকে পাওয়া এই পাথরের এমুলেট এবং হরিনারায়নপুর থেকে পাওয়া চুনাপাথরের গবাদি পশুর ফিগার নিয়ে আলোচনা করে এদের বৈশিষ্ট্য যে মৌর্য শিল্পকলার সাথে মিলে তার উপর আলোকপাত করেন। এর মাধ্যমে উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া প্রত্নবস্তুর সময় কাল নির্ধারনে নতুন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর মতে মাঝখানের প্রতিকৃতিটি একটি মাটির পাত্র বা ঘটের উপরে অবস্থিত এবং ডান হাতে মাছ এবং বাম হাতে চাকা অথবা চক্র রয়েছে। ঘটের উপরে উপবিষ্ট বলে তিনি এই মূর্তিটিকে ঘটদেবী বলে অনুমান করেছেন। এ প্রসঙ্গে কঙ্কনদিঘীতে পাওয়া ঘটদেবীর মূর্তি এবং এ অঞ্চলে প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ঘটপূজার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৯৪ সালে দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, এন. গোস্বামী এবং আর. কে. চট্টপাধ্যায় South Asian Studies জার্নালে প্রকাশিত 'Archaeology of Coastal West Bengal: Twenty-four Parganas and Midnapur Districts' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে পাল যুগে কঙ্কনদিঘীতে পাওয়া একটি পোড়ামাটির ভাস্কর্য সম্পর্কে আছেঃ KKNDGH-1: (Fig.13) terracotta-buffish tinge-the surviving fragment 17 by11cm- part of an anthropomorphic vessel-the mouth of the vessel was possibly above the female head-the neck of the vessel was suggested the neck of the female face-however, it is the female head (of a Devi or goddess who is supposed to be personified by the vessel) which deserves attention-note the high eyebrows in relief, protruding chin and high cheek bones, smiling countenance-c.7th/8th cent. A.D.-in a sense predates a form of female face which has been idealized in Bengal and may be seen in the traditionally done face of a Durga image-the present specimen a magnificent example of terracotta art of ancient Bengal.

ঘটদেবী, কঙ্কনদিঘী, পশ্চিমবঙ্গ

মৌর্যযুগের শিল্পকলার বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যে বিশেষ করে রিংস্টোনে (ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্নস্থানে পাওয়া যায়। এর ব্যবহার সম্পর্কে গবেষকগন সন্দিহান, ধারনা করা হয় কোন রকম ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে পারে। পাথরের তৈরি এ রিংস্টোন গুলো ছিদ্রযুক্ত এবং ছিদ্রহীন হয়ে থাকে। এতে বিভিন্ন নকশা ও প্রতিকৃতি খোদাই করা থাকে) একটি প্রতিকৃতির সাথে উপবিষ্ট প্রতিকৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এমুলেটের বাম পাশের গাছটি যাকে দিলিপ কুমার চক্রবর্তী পাম গাছ/তাল গাছ বলে অভিহিত করেছেন এধরনের গাছ এই রিংস্টোনগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। এ কারনে দিলীপ কুমার চক্রবর্তী এবং বুলবুল আহমেদ এই এমুলেট মৌর্যযুগের হবার সম্ভাবনার কথা বলেন।অন্যদিকে হাবীবুল্লাহ পাঠান এবং সুফি মুস্তাফিজুর রহমান এমুলেটে উতকীর্ণ মাঝখানের প্রতিকৃতিটি বিষ্ণুর হতে পারে ধারনা করেন এবং এর নাম দেন বিষ্ণুপট্ট (পাঠান এবং রহমান ২০১২:১৩৯)। এক্ষেত্রে ঘটের উপরের মূর্তিটির ডান হাতে খক্ষ এবং বাম হাতে চক্র থাকার কথা বলেন। মূর্তির ডান দিকের গাছটি তমাল (পাঠান১৯৮৯:৩২) গাছ হিসেবে ধারনা দেন। বুলবুল আহমেদের মতে বাম হাতে চক্র এবং ডান হাতে গদা রয়েছে (আহমেদ ২০০১:৭৯) । এ বিষয়ে আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য æReligious and Auspicious Symbols Depicted on Artifacts of Wari-BateshwarÓ (Pratnatattva 12, p.1-12, Journal of the Department of archaeology, J.U.) নামের প্রবন্ধে রয়েছে। আবু ইমাম, বুলবুল আহমেদ এবং মাসুদ ইমরান যৌথভাবে এই মূর্তিটিকে স্থানীয় যুদ্ধের কোন দেবতা হতে পারে বলে ধারনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মূর্তির ডান হাতে তলোয়ার এবং বাম হাতে ঢাল (শিল্ড) এবং শরীরের উপরের অংশে বর্ম রয়েছে বলে অনুমান করেন। মূর্তির পাশের গাছটির কারনে ধারনা করেন এই দৃশ্যটি হয়তো মন্দির থেকে বাইরে খোলা জায়গায় হয়ে থাকবে। তাদের ধারনা এই এমুলেটটি মৌর্য যুগের থেকেও প্রাচীন সময়ে হবার সম্ভাবনা বেশি এবং লৌকিক কোন দেবতাকে উপস্থাপন করে।এমুলেটে উপস্থাপিত মূর্তিটি ঘটদেবী, বিষ্ণু নাকি প্রাচীন কোন লৌকিক যুদ্ধদেবতা এ বিষয়ে এখনো গবেষনা চলছে। কঙ্কনদিঘীতে পাওয়া পোড়ামাটির মূর্তিটি মৌর্য সময়ের অনেক পরের পাল যুগের। মূর্তিটি ঘটের উপরে ছিল ধারনা করা হয়। ঘটের সংযোগসূত্র বাদে মূর্তিটির মুখের আঙ্গিক, দীর্ঘ গলা এর কোন কিছুর সাথেই উয়ারী-বটেশ্বরের এমুলেটের ভাস্কর্যের কোন মিল নেই।

বিষ্ণু, হানকারাইল, মালদা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ

প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্যের ইতিহাস থেকে দেখা যায় গুপ্তপূর্ব যুগে বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার হানকারাইলে (Hankrail)(Saraswati1962:12)। মূর্তিটিতে চার হাত ছিল যার নীচের দুই হাত ভাঙ্গা, উপরের বাম হাতে শঙ্খ এবং ডান হাতে গোল কোন কিছু ধরা, পিছনে প্রভামন্ডল। বিষ্ণুমূর্তিটি ধারনা করা হয় কুষান যুগের। বিষ্ণু বৈদিক (আনু ১৫০০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) দেবতা, বৈদিক সময়ে তাকে দেবতা সূর্যের সাথে উপস্থাপন করা হত। পরবর্তিতে ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক যুগে বিষ্ণু প্রধান তিন দেবতার একজন দেবতার মর্যাদা পায়। এ সময়ে বিষ্ণুর যে ভাস্কর্যগুলো পাওয়া যায় তাতে বিষ্ণুকে প্রধানত তিন ভঙ্গিমায় দেখা যায়, দাঁড়ানো, বসা বা হেলান দেয়া এবং শোয়া অবস্থায়। দাঁড়ানো অবস্থায় বিষ্ণুরূপে দেখা যায় তার চারটি হাত রয়েছে। ডান দিকের পিছনের হাতে চক্র এবং সামনের হাত অভয় মুদ্রা বা বরদ মুদ্রায়, বাম দিকের সামনের হাতে শঙ্খ এবং পিছনের হাত কোমরের উপর থাকে। পরবর্তিতে বিষ্ণুর আইকনোগ্রাফিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আসে, বিশেষ করে নীচের হাত দুটির ভঙ্গীতে (Rao1914,Vol-1:pp73-84)। বাংলা অঞ্চলে যেমন দেখা যায় নীচের হাত দুটিতে পদ্ম এবং গদা রয়েছে। বিষ্ণুর আইকনে এটি নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় তার চারটি হাত থাকবে।

এমুলেটের মূর্তিটিতে প্রাচীন বাংলার বিষ্ণুর বৈশিষ্টগুলো অনুপস্থিত, বিশেষ করে চার হাতের বিষ্ণু যার চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম থাকবে। এ সময়ে বিষ্ণুর সাথে তার বাহন গড়ুরকেও দেখানো হত। উয়ারী বটেশ্বরে একটি ব্রোঞ্জের গড়ুর মূর্তি পাওয়া গেছে কিন্তু এই এমুলেটে কোথাও গড়ুর মূর্তি নেই। প্রধান বিষয় হল এই এমুলেটের মূর্তিটিতে দুই হাত রয়েছে। তাই এর বিষ্ণু হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

উয়ারী-বটেশ্বরে খননের ফলে হাতকুঠার, বর্ষা, বাটালি ইত্যাদি অস্ত্র পাওয়া গেলেও কোথাও ঢাল বা তলোয়ার পাওয়া যায়নি। এমুলেটের মূর্তিটি প্রাচীন যুদ্ধদেবতা হলে স্থানীয় অস্ত্র হাতে থাকার কথা ছিল। বানিজ্যনগরী হবার কারনে বাইরে থেকেও ঢাল তলোয়ার আসতে পারে, সেক্ষেত্রে স্থানীয় দেবতার হাতে তা থাকার কথা নয়। আবার পুরো এমুলেটটি উয়ারী-বটেশ্বরের বাইরে থেকে এসেছে এমনটিও হতে পারে। মূর্তির নীচের অংশ ঘট হলে তা বাংলা অঞ্চলের হবার সম্ভাবনা বেশি। এমুলেটের মূর্তিটির গঠনশৈলী অনেক আদিম ধাঁচের, মূর্তির নাক, চোখ, উপাসকদের মুখ স্থানীয় ভাবে তৈরি শিল্পদক্ষতার প্রমান করে। মৌর্য যুগের শিল্পকলার বিকাশ মহাস্থানগড় অথবা চন্দ্রকেতুগড়ে যেভাবে হয়েছিল, উয়ারী বটেশ্বর তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল ধারনা করা যায়।

বৌদ্ধ-শিব নৈবদ্য পাত্র, উয়ারী-বটেশ্বর

কেন্দ্রীয় মূর্তিটির ত্রিকোনাকার নাক এবং প্রসস্ত চোখ এখানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের বৌদ্ধ-শিব নৈবদ্য পাত্রের প্রতিকৃতির মূর্তির নাক ও চোখের সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে এমুলেটটি উয়ারী বটেশ্বরেই তৈরি হয়েছে এমন ধারনা করা যায় এবং এর খোদিত শিল্পকর্মটি স্থানীয় প্রাচীন কোন দেবতা বা দেবীর হতে পারে অনুমান করা যায়। এমুলেটের ভাস্কর্যটি সাংক রিলিফ ভাস্কর্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন। এধরনের সাংক রিলিফ ভাস্কর্য প্রাচীন মিশরে প্রচলিত ছিল, বিশেষ করে পিরামিডের দেয়ালে এভাবে রিলিফ ভাস্কর্য করা হত। এমুলেটের ভাস্কর্যের ফিগারের সাথে মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় পাওয়া সিলের ফিগারগুলোর মিল রয়েছে। মহেঞ্জোদারোর সিল আর এই এমুলেট বানানোর কারিগরি কৌশল একি হতে পারে, তবে কারিগরি কৌশল এক হওয়া মানেই সময়কাল এক হওয়া না।

গড়ুর মূর্তি

গড়ুর ভাস্কর্য, উয়ারী-বটেশ্বর

উয়ারী-বটেশ্বরের বটেশ্বর গ্রামে ব্রোঞ্জের একটি গড়ুর মূর্তি পাওয়া গেছে। এর উচ্চতা ৬.৪ সেন্টিমিটার। এর সময়কাল জানা যায়নি (রহমান এবং পাঠান ২০১২:১৮৭,২০৩)। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সব ধর্মেই গড়ুর একজন গুরুত্বপূর্ন চরিত্র। প্রাচীন কাল থেকে ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় গড়ুরকে একজন গুরুত্বপূর্ন ধর্মীয় চরিত্র হিসেবে শিল্পকলায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অঞ্চলে সাধারনত বিষ্ণুর বাহন হিসেবে গড়ুরকে দেখানো হয়। গড়ুর একটি বিশাল পাখি বা পাখির মত দেখতে। পাখিদের রাজা গড়ুর তার ঈগলের মত পাখা আছে। আদি পুরানে গড়ুরের চরিত্রের বিভিন্ন বর্ননা রয়েছে। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (Sritattvanidhi) গড়ুরের আইকনোগ্রাফি বর্ননা করা হয় গড়ুর হাটু গেড়ে, বাম পা ভূমি স্পর্শ করবে এবং তার মাথার মুকুট সাপ দিয়ে সজ্জিত থাকবে। তার মুখ এবং শরীরে মানুষের মত থাকবে কিন্তু তার নাক লম্বা সুচালো থাকবে। সে দুই হাতে অঞ্জলি (করজোরে) মুদ্রায় থাকবে। সাধারনত এই বেশেই গড়ুর মূর্তিগুলো আমাদের বাংলা অঞ্চলে বিষেশ করে বিষ্ণু মন্দিরে পাওয়া যায়। সবচেয়ে প্রাচীন গড়ুর মূর্তির নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতের বাদামী গুহার ৩ নাম্বার গুহায়। এখানে দেখা যায় গড়ুরের গোলাকার চোখ, সূচালো নাক, ছড়ানো বিশাল পাখা, ডান হাতে একটি সাপ ধরে আছে এবং তার বেশ মেদবহুল পেট আছে (Rao, Volume-1, Part-1:p.286)

পাথরের গড়ুর মুর্তি, বাদামী গুহা

উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া গড়ুর মূর্তিটি একই ভঙ্গীতে করজোড়ে হাটুগেড়ে আছে, পিছনে ছোট দুটি পাখা আছে। হাতে বালা নাক সামনের দিকে অনেক লম্বা। শিরস্ত্রানে গোল করে ঘিরে রাখা অংশটি সাপ হতে পারে। নীচের দুই পায়ের ভঙ্গী ঠিক স্পষ্ট নয়, খুব সম্ভব ভূমিতে ভারসাম্য রাখার জন্য নিরেট রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিমুলের নীচের অংশ মসৃন নয়, কোন কিছুর সাথে জোড়া ছিল বলে মনে হয়। জোড়ার ভাঙ্গা অংশ দেখে অনুমান করা যায় এটি একটি ঘন্টা বা এ ধরনের কিছুর উপরের অংশে গড়ুর মূর্তি ছিল। বর্তমান সময়ে আমরা হিন্দু ধর্মের পূজার উপকরন এই ঘন্টার উপরের অংশে এমন গড়ুর বা হনুমান মূর্তি দেখতে পাই। গড়ুর ঘন্টা ব্যবহৃত হবার কথা জানা যায় ১২ শতকে কম্বোডিয়ার আংকরে। পিটার ডি শ্যারকের (Peter D. Sharrock) 'Garuda,Vajrapani and religious change in Jayavarman VII's Angkor' শিরোনামে Journal of Southeast Asian Studies, 40(1), pp111-151, 2009 প্রবন্ধে ১২ শতকে তৈরি কম্বোডিয়ার আংকরের মন্দিরের গড়ুর মূর্তি নিয়ে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন রাজা জয়বর্মনের (JayavarmanVII: 1181-1218) সময়ে এর মন্দিরগুলোতে অনেক ব্রোঞ্জের পূজার সামগ্রি পাওয়া যায়। এর মধ্যে গড়ুর মূর্তিসহ ঘন্টাও ছিল। এ প্রসঙ্গে বয়সেলিয়ার (Jean Boisselier) Zvi Garuda dans l'art khmèr', p.79 বইয়ে লেখেন The vajras, whether they are authentic vajras or the handgrip on cultic bells, most often bear, as their only element of decoration, small heads or busts of Garudas. This union of the thunderbolt and Garuda seems to us to deserve special mention because it could represent a new aspect of the relationship that would seem to exist between Vajrapani and Garuda'.

গড়ুর ঘন্টা, উত্তর ভারত (১৮২৫-১৯০০)

South Kensington Museum.

গড়ুর মূর্তিটি আদিম সরল ভাবে তৈরি করা হয়েছে। মূর্তিটি গড়ুর ঘন্টার হাতলের উপরের অংশ হলে, তার সময়কাল পাল যুগের পরে হবার সম্ভাবনা বেশি। পাল যুগে বংলা অঞ্চলে অনেক ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য পাওয়া যায়, তাতে ধারনা করা যায় এ সময়ে এখানে ব্রোঞ্জের প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যাবহার ছিলো। ব্রোঞ্জের তৈরী এই ক্ষুদ্র ভাস্কর্যটি সম্ভবত লস্ট ওয়াক্স পদ্ধতিতে করা হয়েছে। এই উপমহাদেশে বহু আগেই সিন্ধু সভ্যতায় এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

উয়ারী-বটেশ্বরে ধাতু গলিয়ে মুদ্রা তৈরি করার প্রযুক্তি জানা ছিল (রহমান এবং পাঠান ২০১২:৬৯) । এখানে প্রচুর পরিমানে লোহার হাতিয়ার ও রুপার মুদ্রা পাওয়া গেছে। সে তুলনায় ব্রোঞ্জের তৈরি প্রত্নবস্তু খুব সামান্য পাওয়া গেছে। ব্রোঞ্জ হল তামা এবং টিনের মিশ্রনে তৈরি। এ অঞ্চলে সে সময়ে ব্রোঞ্জের প্রযুক্তি ছিল কিনা সে সম্পর্কে এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। সেক্ষেত্রে এই ব্রোঞ্জ মূর্তিটির এখানে তৈরি হবার সম্ভাবনা খুবই কম। বানিজ্যনগরী হওয়ায় এ মূর্তিটি বাইরের কোন অঞ্চল থেকে এসেছে ধারনা করা যায়।

ব্রোঞ্জের ঘোড়া

ব্রোঞ্জের ঘোড়া, উয়ারী-বটেশ্বর

ব্রোঞ্জের একটি ঘোড়া পাওয়া গেছে বটেশ্বর গ্রামে। এটি ৭.৬ সেন্টিমিটার লম্বা এবং উচ্চতা ৪ সেন্টিমিটার। এর পিছনের দিকের দুই পায়ের নিচে ছিদ্র আছে, সামনের দিকের পা দুটি ভাঙ্গা। সরু লম্বা গলায় সাজানো কেশর রয়েছে আর কান দুটি বেশ লম্বা আকৃতির। এর সময় কাল জানা যায়নি। বাংলা অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ঘোড়ার শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারনত শিশুতোষ খেলনা হিসেবে অনেক পোড়ামাটির ঘোড়া তৈরি হয়, সাথে পায়ের নীচে চাকা লাগিয়ে খেলা হয়। বর্তমানে বাংলার বিভিন্ন গ্রামের মেলায় এ ধরনের গরু বা ঘোড়ার গাড়ি দেখা যায়। বটেশ্বরের ঘোড়ার পায়ের নীচের ছিদ্র দেখে ধারনা করা যায় এতে চাকা লাগানো থাকতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষে ঘোড়া ছিলো কি ছিলোনা এই নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। বন্য ঘোড়ার কোন নিদর্শন এই অঞ্চলে পাওয়া যায়নি। গৃহপালিত ঘোড়ার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় হরপ্পা সভ্যতায় (An Encyclopedia of Indian Archaeology, Edited by A. Ghosh, Volume one, 1989:p-4) । তবে তা বিশুদ্ধ জাতের ঘোড়া (true horse ‘Equus Caballus’) কিনা এ নিয়ে বিতর্ক এখনো চলছে। এখানে অনেক পোড়ামাটি ও ব্রোঞ্জের তৈরি ঘোড়াসদৃশ ছোট ভাস্কর্য পাওয়া যায়, যা ঘোড়া না ষাড় এ নিয়ে গবেষকগন এখনো নিশ্চিত হতে পারেননি। এখানে পাওয়া ভাস্কর্যগুলির পায়ের সাথে ছিদ্র করে শুধু চাকা লাগানো বা ষাড়/ঘোড়ার গাড়ি বা রথ বানানো পাওয়া যায়।

পোড়ামাটির ঘোড়া, চন্দ্রকেতুগড়

পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড়ে (খৃস্টপূর্ব ৪০০-৮০০) পোড়ামাটির ঘোড়ার অনেক ক্ষুদ্র ভাস্কর্য ও রিলিফ ভাস্কর্য পাওয়া যায়, যার নীচে চাকা লাগিয়ে দুচাকার গাড়ি বানানো হয়। পোড়ামাটির এই ঘোড়ার ভাস্কর্য গুলো পেশিবহুল, স্থবির, যথেস্ট ডিটেইল করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কিছু ঘোড়ার মাথায় হেডব্যাণ্ড দেখা যায়, ঘোড়ার খুর ও নাক, মুখ বাস্তবানুগ করার চেষ্টা রয়েছে। এখানে পাওয়া দেবতা বা দেবীর অন্যান্য ভাস্কর্যগুলোতে যেমন শিল্পনৈপুণ্যের প্রমান পাওয়া যায় ঘোড়ার ক্ষুদ্র ভাস্কর্যগুলো সে তুলনায় কাঁচা হাতের কাজ মনে হয়। বটেশ্বরে পাওয়া ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যটিতে পেশির কোন বাহুল্য নেই, বরং অনেক সরলীকরণ করে জ্যামিতিক আকার দেয়া হয়েছে। বাস্তবানুগ করার কোন চেস্টা নেই বরং স্টাইলাইজড এই ফিগারের মধ্যে দুর্দান্ত গতি আনা হয়েছে পিছনের পায়ের দিকে উঁচু করে। ঘোড়ার কেশরের কাজে এবং এর গতিময়তা শিল্পদক্ষতার প্রমান করে। সেক্ষেত্রে চন্দ্রকেতুগড়ের পোড়ামাটির ঘোড়াগুলির সাথে এই ভাস্কর্যটির কোন যোগাযোগ আছে মনে হয়না। তবে ব্রোঞ্জ এবং পোড়ামাটির তৈরি শিল্পদ্রব্যের আঙ্গিক গত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ে প্রধানত পোড়ামাটির শিল্পদ্রব্যই বেশি পাওয়া গেছে। এখানে পাওয়া ব্রোঞ্জের ছোট আয়না হাতে নারী (সম্ভবত পার্বতী) এর সময়কালও অনেক পরে, গুপ্ত যুগের শেষের দিকে। ঘোড়া হল দেবতা সূর্যের বাহন। বৈদিক যুগে ঋগবেদে সূর্য দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তখনকার সময়ে সূর্যকে চিত্রায়িত করা হয়নি। পরবর্তিতে সূর্য দেবতাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থে এবং জায়গাভেদে বিভিন্নরুপে চিত্রায়ন করা হয়েছে। সুপ্রাবেদগামা (The Suprabhedagama), শিল্পরত্ন (The Silpratna), অগ্নিপুরাণ

(Agnipurana) ইত্যাদি পুরাণগুলি সহ বেশির ভাগ গ্রন্থেই সূর্যের যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় দেবতা সূর্য ঘোড়ার উপরে অথবা ঘোড়া চালিত রথে আসীন থাকবেন। রথটি সাতটি ঘোড়া টেনে নিয়ে যাবে এবং এর একটি মাত্র চাকা থাকবে।

পাথরের সূর্যদেবতা, কুমারপুর, রাজশাহী

গুপ্তপূর্ব যুগ থেকে সূর্য দেবতার নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলা অঞ্চলে। রাজশাহী জেলার কুমারপুরে পাওয়া সূর্য দেবতার নীচের প্যাডেস্টালে সাতটি ঘোড়ার রিলিফ দেখা যায়। এসময়ে পাওয়া নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরের আরেকটি সূর্য ভাস্কর্যে আবার ঘোড়ার উপস্থিতি নেই। ধারনা করা যায় এ সময়ে দেবতা বা দেবীর আইকনোগ্রাফির বাধাধরা নিয়ম নির্দিষ্ট ছিল না (saraswati 1962:p12-13)। এ অঞ্চলে প্রায় ২১০ টির মত সূর্য মূর্তি পাওয়া গেছে (হক ১৯৯২) বেশির ভাগেই নীচের দিকে সাতটি ঘোড়া রয়েছে। প্রায় ১২শতক পর্যন্ত সূর্য পূজা জনপ্রিয় ছিল এ অঞ্চলে। ধর্মীয় কারনে ধারনা করা যায় ঘোড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখানে। সূর্যের সাথে ছাড়াও আলাদা ভাবে ঘোড়া তৈরি করা হত। সূর্য মূর্তির সাথে পাওয়া ঘোড়ার রিলিফগুলো মাসলযুক্ত, এনাটমি অনুসরন করা হয়েছে। গুপ্তযুগে ভাস্কর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎকর্ষ সাধন করেছে। উয়ারী বটেশ্বরে পাওয়া ঘোড়াটি অপেক্ষাকৃত সরলাকৃতির, শৈলীকৃত/স্টাইলাইজড, অপেক্ষাকৃত জ্যামিতিক। সুবিন্যস্ত কেশর দেখে এর নির্মানে দক্ষতা রয়েছে বোঝা যায়। মাসলের মাধ্যমে এর গতি না এনে সরলীকরণের মাধ্যমে পিছনের পায়ের অংশ উঁচু করে গতি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সামনের মুখেও জ্যামিতিক সরলতা লক্ষ্য করার মত।গলা বেশ সরু ও লম্বা করে ভাস্কর্যের ভারসাম্য এবং নান্দনিকতা আনা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও ঘোড়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট অটুট রয়েছে। একমাত্র সুদক্ষ শিল্পীর পক্ষেই তা ব্রোঞ্জে করা সম্ভব। গুপ্ত যুগে পাওয়া ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যগুলো তুলনামূলক ভাবে অনেক সূক্ষ এবং আলংকারিক। সে তুলনায় বটেশ্বর গ্রামে পাওয়া ভাস্কর্যটি অনেক আদিম ধারার যা প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাওয়া হরপ্পা সভ্যতার প্রানীদের স্টাইলের সাথে মেলে কিন্তু সেখানে এই গতি ছিল না। স্টাইলাইজড করা এমন সাবলীল গতি আধুনিক ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর সাবলীল গতি, সুদক্ষভাবে করা স্টাইলাইজড শরীর এবং কেশরের নৈপুন্য অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালপর্ব পালযুগের পরে হবার কথা ইংগিত করে। অসাধারন এই ভাস্কর্যটির কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে সময়কাল নির্নয় করা খুবি জরুরি। এর সময়কাল বাংলার শিল্প ইতিহাসে নতুন কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

পোড়ামাটির শিল্পদ্রব্য

বেশির ভাগ গবেষকদের মতে বাংলা অঞ্চলে পাথরের প্রাচুর্যতা না থাকায় এখানকার শিল্পকলার প্রাথমিক বিকাশ হয়েছে পোড়ামাটিতে। মাটি ছিল এখানে সবচেয়ে সহজলভ্য, তাই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পোড়ামাটির শিল্প এখানে বিকাশ লাভ করে। প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতা থেকে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়, উয়ারী-বটেশ্বর সর্বত্রই পোড়ামাটির শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব জায়গায় বিশেষ করে আমাদের চারপাশের বিভিন্ন দৃশ্য- প্রানী, পাখী, মানুষ, ফুল, গাছপালা, গ্রামের জীবনযাত্রা, কাজকর্ম, ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকগাথা ইত্যাদি দেখানো হয়। এদের তৈরীর ধরনের উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগে আদিম এবং সরল ধারায় তৈরী, সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত দেখা যায়। বিশেষ করে গ্রামে বিভিন্ন উৎসবে এবং মেলায়। এদেরকে সময়হীন (ageless) ভাস্কর্য/খেলনা বলা যায়। অপরপক্ষে অন্য ধরনের পোড়ামাটির দ্রব্যগুলো শিল্পমন্ডিত, নান্দনিকতা আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় অনুযায়ী তার শিল্পধারায় পরিবর্তন এসেছে। (S.K. Saraswati:p93) উয়ারী-বটেশ্বরে বেশ কিছু ক্ষুদ্রাকার পোড়ামাটির প্রানী, মানুষের ভাস্কর্য আবিস্কার হয়েছে। এগুলো শিশুতোষ খেলনাও বলা যেতে পারে। এগুলো প্রথম ভাগে পরে, এদের তৈরি খুবই আদিম ও সরল। খুব সাধারন ভাবে হাতে মাটি নিয়ে আঙ্গুলের চাপে মানুষ বা প্রানীর অবয়ব দেয়া হয়। সাধারনত এপ্লিক পদ্ধতিতে পরে ফিগারে চোখ বা অলঙ্করণ যোগ করা হয়। তবে উয়ারী-বটেশ্বরে এমনটা কম দেখা যায়। বেশিরভাগ চতুস্পদী প্রানীগুলো ভাঙ্গা থাকায় সঠিক ভাবে সব প্রানী চিহ্নিত করা যায়নি। এরমধ্যে ঘোড়া, হরিন, পাখী, পুরুষ ও নারী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ঘোড়ার মাথার অংশ পাওয়া ভাস্কর্য এবং আরো কয়েকটি প্রানীর গায়ে বৃত্তাকার চিহ্ন দেখা যায়। কোন বৃত্তাকার বস্তু দিয়ে এই ছাপ দেয়া হয়েছিল ধারনা করা যায়।

উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া পোড়ামাটির প্রানীদের গায়ে বৃত্তাকার ছাপ

এর পিছনে ধর্মীয় কোন কারন অথবা শুধুমাত্র অলংকরনের জন্য এই ছাপ দেয়া হতে পারে। কারন এখানে পাওয়া ব্রোঞ্জের বৌদ্ধ-শিব নৈবদ্য পাত্রেও এমন বৃত্তাকার নকশা দেখা যায়। এই বৃত্তাকার ছাপ এখানকার শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য হতে পারে।এখানে পাওয়া নারী ভাস্কর্যটি খুব সাধারন টেপা পুতুলের আদলে তৈরী। পুরুষ ভাস্কর্যটির বুকে আড়াআড়ি ক্রস চিহ্ন দেয়া এবং কোমরে নকশাকাটা কোমরবন্ধনি রয়েছে। এখানে পোড়ামাটির একটি নিদর্শন আবিস্কৃত হয় যাকে চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া একটি নিদর্শনের নীচের দিক মিল আছে বলে নেত্রদেবী হতে পারে বলা হয়েছে (রহমান এবং পাঠান ২০১২:পৃ১৮৯,১৯৯)।

পোড়ামাটির যক্ষ, উয়ারী-বটেশ্বর

দ্বিতীয় ভাগে পরে এমন পোড়ামাটির নিদর্শনের সাথে মিল আছে পোড়ামাটির যক্ষ মূর্তিটির। এটি একটি পোড়ামাটি ফলক । এই ফলকগুলি ঘর বা মন্দিরের বাইরে লাগিয়ে অলংকরণ করা হয়। পোড়ামাটির ফলক তৈরী করে প্রধানত মন্দির, সমাধি সৌধ ইত্যাদির উপরে লাগিয়ে অলংকরণ করা হয়। তাই একসাথে অনেক পরিমানে বানানো হয়। উয়ারী বটেশ্বরে বিচ্ছিন্ন ভাবে পাওয়া একটি মাত্র ফলক কৌতুহলকর। এ জায়গায় পোড়ামাটির যেসব শিল্প নিদর্শন পাওয়া গেছে সব আদিম পর্যায়ের। সেখানে এই ফলকটির অবয়বে শিল্পদক্ষতা স্পষ্ট। স্থানীয় অন্যান্য পোড়ামাটির শিল্পকর্মের সাথে এর শিল্পগত বৈশিষ্টেও মিল নেই। চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকের সাথে এর মিল আছে। এই যক্ষ মূর্তিটি শুঙ্গ যুগের (রহমান এবং পাঠান২০১২:পৃ১৯০)।

উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া প্রতিটি শিল্পদ্রব্যই চিত্তাকর্ষক। এখানে পাওয়া পোড়ামাটির শিল্পদ্রব্যগুলো বেশিরভাগ আদি ঐতিহাসিক সময়ের এবং স্থানীয়ভাবেই তৈরী হয়েছে ধারনা করা যায়। এখানে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যাবহার ছিল তা বোঝা যায় এখানে পাওয়া বেশ কিছু তামা ও ব্রোঞ্জের প্রত্নদ্রব্য থেকে। কিন্তু এখানে তামা বা ব্রোঞ্জের প্রযুক্তির কথা নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। সেক্ষেত্রে এখানে পাওয়া ব্রোঞ্জের গড়ুর মূর্তি এবং ঘোড়া এই অঞ্চলের বাইরে থেকে এসেছে এসেছে ধারনা করা যায়। বানিজ্যনগরী হওয়ার কারনে সেই সম্ভাবনা বেশি। গড়ুর মূর্তিটি ঘন্টার সাথে থাকলে এর সময়কাল ১২শতক বা এর পরের হতে পারে। ঘোড়ার ক্ষুদ্র ভাস্কর্যটির নীচে চাকা থাকার সম্ভাবনা, এর সরল জ্যামিতিক ফর্ম আদি ঐতিহাসিক যুগের কথা মনে করিয়ে দেয় কিন্তু এর নির্মান দক্ষতা, সাবলীল গতি আধুনিক স্টাইলাইজড ভাস্কর্য হবার কথা ইঙ্গিত করে। সেক্ষেত্রে এর সময়কাল পাল যুগের অনেক পরে হবার কথা। অবশ্য এখানে প্রধানত বাংলা অঞ্চলের ভাস্কর্যের সাথে তুলনামূলক বিচার করা হয়েছে। উয়ারী-বটেশ্বরের দূর্গনগরীর আদি ঐতিহাসিক সময়ে বহু দূর এমনকি রোমের সাথে বানিজ্যিক সম্পর্ক ছিল ধারনা করা হয়। সেক্ষেত্রে বাংলা অঞ্চলের বাইরে এমন স্টাইলাইজড ফিগার চর্চা হচ্ছে এমন জায়গা থেকেও ঘোড়াটি আসতে পারে। উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া ব্রোঞ্জ, তামা, লোহা, রুপা এসব প্রত্নবস্তু গুলো বেশিরভাগ উপরিপৃষ্ঠ সংগ্রহ হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে (রহমান এবং পাঠান২০১২:১৮৫)। উপরিপৃষ্ঠে পাওয়া গেলে এর সময়কাল খুব পুরানো হবার কথা নয়। পাথরের রক্ষাকবচটি নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন যুক্তির আলোকে সবাই এই বিষয়ে একমত যে এই এমুলেট মৌর্য বা তার আগের সময়ের এবং এখানে উৎকীর্ন দেবী/দেবতা স্থানীয় কোন দেবী/দেবতা হতে পারে। এই শিল্পদ্রব্যগুলো বাংলাদেশের শিল্পকলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এবিষয়ে আরো গবেষণা এবং কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে এর সময়কাল নির্ধারন শিল্প ইতিহাসে নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ

১। সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান ২০১২, উয়ারী-বটেশ্বরঃ শেকড়ের সন্ধানে, ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন।

২। বুলবুল আহমেদ ২০০১, নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা, ঢাকাঃ রাইটার্স ফাউন্ডেশন।

৩। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৯।

৪। সুফি মোস্তাফিজুর রহমান(সম্পা), প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য , বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকাঃ ২০০৮ ।

৫। মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনঃ উয়ারী বটেশ্বর, গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী, বটেশ্বর, বেলাব, নরসিংদী ১৯৮৯ ।

৬। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদি পর্ব, প্রথম দ্বেজ সংস্করণঃ ১৪০০, কলকাতা।

৭। এ কে এম শাহনাওয়াজ, মাসউদ ইমরান, মানচিত্রে বাংলার ইতিহাস, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ঢাকাঃ২০১১।

৮. D.K. Chakrabarti, Ancient Bangladesh, (Dhaka, 1992)

৯. Enamul Haque, S.S.Mostafizur Rahman and Kamrul Ahsan, A Priliminary Report on Wari-Bateshwar Trial Excavation by ICSBA, (Dhaka, 2001)

১০. Enamul Haque, The Art Heritage of Bangladesh, ICSBA,Dhaka,2007.

১১. A. Ghos (ed), An Encyclopaedia of Indian Archaeology, Vol.1, (New Delhi 1989)

১২. Willem Van Schendel, A History of Bangladesh, Cambridge University Press; 1 edition (March 2, 2009)

১৩. Gerd J.R. Mevissen, Surya in Bengal Art, Sculptures in Bangladesh [SciBa]. An Inventory of Select Hindu, Buddhist and Jain Stone and Bronze Images in Museums and Collections of Bangladesh (up to the 13th Century), edited by Enamul Haque and Adalbert J. Gail. Dhaka: International Centre for Study of Bengal Art, 2008 (Studies in Bengal Art Series No. 8)

১৪. Gregory L. Possehl (ed), Harappan Civilization A Contemporary Perspective, Aris and Phillips Ltd-Warminster-England, In Cooperation with American Institute of Indian Studies.

১৫. Bijan Mondal, A Catalogue of the Antiquities in the Chandraketugarh, College Museum, UGC Senior Research Fellow, Department of Archaeology University of Calcutta.

১৬. T. A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography, Volume 1, Part 1, The Law Printing House, Madras1914

১৭. Jens M. Daehner, Kenneth Lapatin, Ambra Spinelli (ed), Artistry in Bronze The Greeks and Their Legacy, XIXth International Congress on Ancient Bronzes, TheJ. Paul Getty Museumand theGetty Conservation Institute,
Los Angeles 2017.

১৮. Sheila L. Weiner, From Gupta to Pala Sculpture, Artibus Asiae, Vol.25, No.2/3(1962), pp.167-192, Published by: Artibus Asiae Publishers, https://www.jstor.org/stable/3249253

১৯. Muhammad Kamal Hossen Akanda, Pierluigi Rosina, Pedro P. Cunha, Swadhin Sen, S. M. K. Ahsan, Alteration of the Alluvial Deposits of Wari-Bateshwar: Geoarchaeological Relevance of the Characterization of Grain Size and Clay Mineralogy, Pratnatattva Journal of the Dept. of Archaeology Jahangirnagar University, Vol. 21; June 2015: 15-39.

২০. Gavin D. Flood, An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press 1996.

২১. Peter D. Sharrock, Garuda, Vajrapani and religious change in Jayavarman Vll’s Ankor, Journal of Southeast Studies, 40(1), pp 111-151, February 2009.

২২. D.K. Chakrabarti, N.Goswami and R.K. Chattopadhyay, Archaeology of coastal West Bengal: Twenty-four Parganas and Midnapur Districts, South Asian studies (Society for South Asian Studies), Volume-10, 1994.

২৩. R.C. Majumder, History of Ancient Bengal, Published by G.K.Roy Mukherjee, G. Bharadwaj and CO. Calcutta, 1971(First Edition).

২৪. S.K. Saraswati, Early Sculpture of Bengal, Published by Ramendranath Mukherjee, Calcutta, 1962.

২৫. Debala Mitra, Bronzes from Bangladesh: a study of Buddhist images from District Chittagong, Agam kala Prakashan, Delhi, 1982.

২৬. Anusua Sengupta, Buddhist Art of Bengal (From3rd Century B.C. To The 13th Century A.D.), Rahul Publishing House, Delhi, 1993.

২৭. Muhammad Kamal Hossen Akanda, Perluigi Rosina, Pedro P. Cunha, Swadhin Sen and S. M. K. Ahsan, 'Alteration of the Alluvial Deposits of Wari-Bateshwar: Geoarchaeological Relevance of the Characterization of Grain Size and Clay Mineralogy, Pratnatattva, Journalof the Department of Archaelogy, Vol.21; June 2015 Jahangirnagar University, Savar, Dhaka.

২৮. S.H. Jahan, Wari-Bateshwar: an Important Centre of Maritime Activities in Ancient Bengal, Journal of Bengal Art, Vol-4, 1999.

২৯. Dilip K. Chakrabarti, Two examples of Maruyan Art from Bengal, Journal of Bengal Art (Vol.1, 1996)

৩০. Abu Imam, Bulbul Ahmed and Masood Imran,Religious and Auspicious Symbols Depicted on Artifacts of Wari-Bateshwar, (Pratnatattva, Vol-12, Journal of the Department of archaeology, J.U.)

চিত্রসমূহ

চিত্রিত মাটির পাত্র, উয়ারী বটেশ্বর

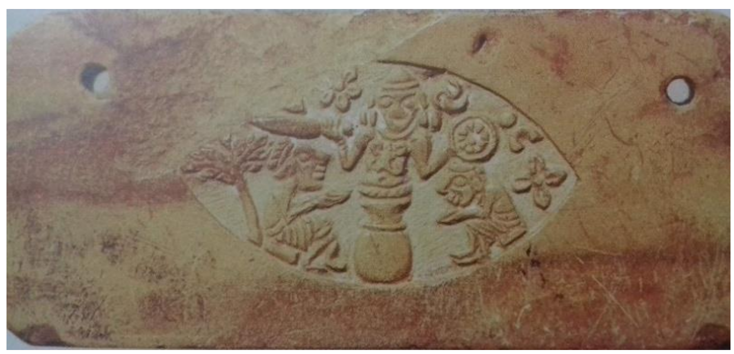

পাথরের এমুলেট, উয়ারী-বটেশ্বর

ঘটদেবী, কঙ্কনদিঘী, পশ্চিমবঙ্গ

বিষ্ণু, হানকারাইল, মালদা জেলা, পশ্চিমবঙ্গ

বৌদ্ধ-শিব নৈবদ্য পাত্র, উয়ারী-বটেশ্বর

গড়র ভাস্কর্য, উয়ারী-বটেশ্বর

পাথরের গড়র মুর্তি, বাদামী গুহা

গড়ুর ঘন্টা, উত্তর ভারত (১৮২৫-১৯০০)
South Kensington Museum.

ব্রোঞ্জের ঘোড়া, উয়ারী-বটেশ্বর

পোড়ামাটির ঘোড়া, চন্দ্রকেতুগড়

পাথরের সূর্যদেবতা, কুমারপুর, রাজশাহী

উয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া পোড়ামাটির
প্রানীদের গায়ে বৃত্তাকার ছাপ

পোড়ামাটির যক্ষ, উয়ারী-বটেশ্বর